দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 24 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা

(৯ পৃষ্ঠার পর)

উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে ছিল না। এসব প্রতিষ্ঠান তৈরিতে এ দেশের তিন ধরনের লোকের অবদান ছিল : স্ব-স্ব ধর্মপন্থী ঐতিহ্যগত non-secular শিক্ষায় আগ্রহী হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন এবং পাশ্চাত্য ভাষার (এ ক্ষেত্রে ইংরেজি) মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারে উৎসাহী একদল লোক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ প্রয়োজন, কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৮২৪ সালে, বারাণসীর কলেজের তেত্রিশ বৎসর পর। অর্থাৎ পঁয়-তাল্লিশ বছরের মধ্যে তিন ধরনের শিক্ষাকাঠামো ও লক্ষ্য নিয়ে তিনটি বিদ্যায়তন কলকাতায় চালু হয়ে গেল। এতে আমাদের বক্তব্যেরই সমর্থন মিলছে যে, এ দেশের সচেতন নাগরিকদের ভিতরে উপযুক্ত তিন ধরনের মানুষজন ছিলেন।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এদেশে স্বাভাবিকভাবে সমাজচিন্তায় ও শিক্ষা-ধারণায় এই তিন শ্রেণীর মানুষের দু'ধরনের ভাবধারা—সেক্যুলার ও নন-সেক্যুলার- এখন পর্যন্ত প্রবলভাবে সক্রিয়।

ভারতে শিক্ষাব্যবস্থাপনা নিয়ে লর্ড মেকলের বিখ্যাত 'মিনিট' শিক্ষাদর্শনের স্তম্ভ হিসেবে ফলপ্রসূ হল ১৮৩৫ সালের মার্চে। তার মিনিটের সারমর্ম ছিল, ভারতে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা একমাত্র ইংরেজির মাধ্যমেই সম্পন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত। তিনি এমন কি এ সুপারিশও করেছিলেন যে, মাদ্রাসা-সংস্কৃত কলেজাদি সব বন্ধ করে দেয়া হোক : 'I would strike at the root of the bad system. I would atonce stop the printing of Arabic and Sanskrit books. I would abolish the Madrasa and Sanskrit College at Calcutta. No stipends should be given to any student who may repair to the Sanskrit College at Benares and the Muhammedan College at Delhi.' এত তেজ ও জেদের সঙ্গে এই মত প্রকাশের পিছনে মেকলের নিজস্ব মাতৃভাষাপ্রেম ও সংস্কৃতিপ্রেম হয়তো ছিল, কিন্তু কোনো গোঁয়ার্তুমি ছিল; বরং তার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনার শক্তি ও কাণ্ডজ্ঞান তার প্রখর ছিল। ইংরেজির জনপ্রিয়তা ও বাজারদর তিনি হিসেবের মধ্যে ধরেছিলেন, বোঝাই যায়। কলকাতায় স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু কলেজ স্থাপনের পরপরই। সোসাইটি প্রকাশিত ইংরেজি বইয়ের বিপুল চাহিদা ছিল। একটি তথ্য বলছে যে, একবার দু'বছরে তারা একত্রিশ হাজার বই বিক্রি করেছিলেন। সেকালে শিক্ষার নগণ্য হার বিবেচনায় আনলে এই পরিসংখ্যান নিশ্চিতভাবে ইংরেজির বিজয়াভিযান প্রমাণ করে। মেকলে বলছে-'শাসকশ্রেণী ইংরেজিতে কথা বলে। যারা সরকারের বিভিন্ন পদে আসীন সেই সব উচ্চবংশীয় স্বদেশীয়রা ইংরেজিতে কথা কয়। প্রাচ্যদেশীয় সমস্ত সমুদ্রের আশপাশের অঞ্চলে ইংরেজি ব্যবসায়িক লেনদেনের ভাষায় পরিণত হতে যাচ্ছে।' গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক খুশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দিলেন, ১৮৩৫ সালের মার্চ মাসেই। কিন্তু মেকলের সব সুপারিশ তাঁরা মানলেন না, মাদ্রাসা আর সংস্কৃত কলেজগুলো বন্ধ করে দেয়া হল না। কিন্তু যা করা হল তা আরো ভয়াবহ, কারণ তার অনিচ্ছাকৃত এক সুদূরপ্রসারী ফল, প্রকৃত অর্থে কুফল, ভবিষ্যতের ওপরে করাল ছায়া ফেলবে। নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর করে তারা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচি সঙ্কুচিত করলেন : বিজ্ঞানের নানা বিষয় যে পড়ানো হত তা বাদ দেয়া হল। এর ফলে উভয় প্রতিষ্ঠানই মুখ্যত ধর্মীয় ভাষা ও ধর্মশাস্ত্র পঠনপাঠনের স্থানে রূপান্তরিত হল, এতে সমকালের সঙ্গে তার সংযোগ অনেকটাই ছিন্ন হয়ে গেল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল এর বাইশ বছর পরে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। অনুমান করা চলে, পরবর্তী সাঁইত্রিশ বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৪ সাল নাগাদ এ দেশে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা আরো দৃঢ়মূল ও গভীর হয়েছে। আরবি-ফার্সি বা সংস্কৃত সম্বন্ধে আমাদের প্রধান দুটি ধর্মীয় সমাজ হিন্দু ও মুসলমানের যতই শ্রদ্ধা, মোহ ও দুর্বলতা থাকুক না কেন, দেশে এই বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে জীবনে দাঁড়ানো যাবে না, আর সে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যম সংস্কৃত বা আরবি-ফার্সি নয়, ইংরেজি।

ইংরেজরা এ দেশে আসার পরে শিক্ষাসংক্রান্ত এই দৃষ্টিভঙ্গির ফল দূরগামী হয়েছে। এ দেশে যত প্রকার সংস্কার-আন্দোলন হয়েছে, সমাজ-রাজনীতি-শিক্ষা, সব ক্ষেত্রেই জনগণের চৈতন্য-বিকাশের যে অভিব্যক্তি প্রকাশিত হতে দেখি তা বহির্বিশ্বের ধ্যানধারণার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যতিরেকে সম্ভব ছিল না এবং এই যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেই ইংরেজি শিক্ষা অনিবার্য ছিল। এ শিক্ষারই পরোক্ষ অবদান nationalism বা স্বাজাত্যপ্রেম এবং secularism বা ইহজাগতিকতা। বঙ্গদেশে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম রূপান্তর ঘটল ইংরেজদের হাত দিয়ে পশ্চিমী শিক্ষাধারণা প্রতিষ্ঠায়।

৩

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বাঙালি উপাচার্য নিযুক্ত হলেন বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯০ সালের ১লা জানুয়ারি। ১৮৯২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করে ছিলেন। প্রথম সমাবর্তন অভিভাষণে (জানুয়ারি ১৮৯১) তিনি সর্ব প্রথম একটি কথা উচ্চারণ করলেন, যা ইতিপূর্বে কেউ বলেন নি। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার কথা তিনি বললেন। বলেছিলেন : I firmly believe that we cannot have any through and extensive culture as a nation, unless knowledge is disseminated through our own Vernacular. [...] the dark depths of ignorance all around will never be illumined until the light of knowledge reaches the masses through the medium of thier own vernaculars: এবং শুধু মাধ্যম হিসেবে নয়, অধ্যয়নের বিষয় হিসেবেও মাতৃভাষার পঠনপাঠন আবশ্যিক বলে তার মতামত ব্যক্ত করলেন : I also deem it not merely desirable, but necessary that we should encourage the study of those Indian vernaculars that have a literature by making them compulsory subjects of our examinations. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সে সময়ে সিন্ডিকেটের সদস্য। উপাচার্যের ভাষণের সূত্র ধরে রেজিস্ট্রারের নিকট কয়েকটি প্রস্তাব পাঠালেন সিন্ডিকেটে বিবেচনার জন্য। প্রথম প্রস্তাবটি ছিল এই : 'In the Arts Examination Candidates who take up Sanskrit should also be examined either in Bengali or Hindi or Urdu.' এ প্রস্তাব সিন্ডিকেটে পাঠানোই হয়নি, তার পূর্বে Arts Faculty'র মিটিংয়ে অনেক আলোচনা ও বাদপ্রতিবাদের পর প্রস্তাব-টিকে নাকচ করে দেয়া হল।

পরের বছর (১৮৯২) সমাবর্তন ভাষণে উপাচার্য গুরুদাস আবার বললেন : One great reason why our University fails to awaken much original thinking is because it is imparted through the medium of a difficult foreign language, the genius of which is so widely different from that of our own. The acquisition of such a language must to a great extent be the work of imitation; and the habit of imitation gradually becomes so deeprooted as to influence our intellectuel operations generally. Again the costly foreign drapery in which our students have to clothe their thought takes their limited mental resources to an extent which does not leave enough for the proper feeding of thought." অর্থাৎ "যে কঠিন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমরা শিক্ষা দিই-আমাদের ভাষার সঙ্গে তার প্রকৃতির পার্থক্য দুস্তর। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে মৌলিক চিন্তা জাগ্রত করতে সমর্থ হয় না এইটি তার একটি মুখ্য কারণ। এই রকম একটি ভাষাকে আয়ত্ত করতে গেলে অনুকরণের প্রয়াসই প্রাধান্য পায়। আর এই অনুকরণের অভ্যাস ক্রমে ক্রমে এমনই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তা ছাড়া যে দুর্মূল্য বিদেশী বেশবাস দিয়ে আমাদের ছাত্ররা আপন আপন ভাবনাকে সজ্জিত করতে বাধ্য হয় তার জন্যে তাদের মনঃশক্তির এতই অপচয় ঘটে যে তাদের চিন্তার খোরাক যোগানোর জন্যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।" (অনুবাদঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য) রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হল 'সাধনা' পত্রিকায় এ বছরের (১৮৯২) ডিসেম্বর মাসে; এরও বিষয় মাতৃভাষায় শিক্ষাদান। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে ১৮৮৩ সালের অক্টোবরের 'ভারতী' পত্রিকায় 'ন্যাশনল ফন্ড' শিরোনামে তিনি একটি প্রবন্ধে এই একই কথা বলেছিলেন, কিন্তু সে কথা তখন কোনো শ্রোতা পায়নি। এখন নতুন করে আবার সে বক্তব্য তিনি জনসমক্ষে উপস্থাপন করলেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন ১৯০৬ সালের ৩১শে মার্চ। একনাগাড়ে আট বৎসর উপাচার্য ছিলেন তিনি। তার উপাচার্য হওয়ার পূর্বেই ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সর্বপ্রথম প্রবেশিকা থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের মাতৃভাষা-জ্ঞানের পরীক্ষা নেয়ার নিয়ম চালু হয়, যদিও এ পরীক্ষা ছিল একেবারেই প্রাথমিক স্তরের। কিন্তু আশুতোষের আট বছর মেয়াদী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনকালে বাংলা ভাষা চর্চা ও সেই ভাষার সূত্রে দেশীয় সংস্কৃতিচর্চার যে কর্মযজ্ঞের সূচনা তিনি করেছিলেন তার প্রভাব দেশের বিদ্বৎসমাজে ও জনচিত্তে বিপুলভাবে পড়েছিল। দেশে তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বয়কট করে এর প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এর নাম হয়েছিল 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ এন্ড স্কুল' এবং 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট'। উভয়েরই প্রতিষ্ঠা ১৯০৬ সালে। সাধারণভাবে এ দুটোর একটি একক নাম চালু ছিল, তা হল 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ'। ১৯১০-এ এই দুই বিদ্যায়তন মিলে এক হয়ে গিয়েছিল ' বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ এ্যান্ড টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট'। এরই বিবর্তিত রূপ এখনকার যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়। প্রতিদ্বন্দ্বী এই শিক্ষা ব্যবস্থার দিকস্থিতি ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা। ভাষাকে কেন্দ্র করে দেশাত্ম-চেতনায় পৌঁছতে চেয়েছিলেন তারা। দৃষ্টিকোণের কেন্দ্রবিন্দুতে লক্ষ্যনিরপেক্ষ জ্ঞানসাধনা ছিল না। নিজের দেশ ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সবেরই পঠনপাঠন-অনুশীলন-গবেষণা লক্ষ্য ছিল এবং পাঠ্যসূচি ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বিস্তৃততর। অধ্যাপক বিনয় সরকারের তথ্য অনুসারে, স্যার আশুতোষের পরোক্ষ সম্মতি এতে ছিল, কিন্তু একাধারে হাইকোর্টের বিচারপতি ও সরকার-পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ায় তার পক্ষে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করা অসম্ভব ছিল। 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ'-এর দেশের তাবৎ বিদ্বজ্জন জড়িত ছিলেন।

দেখা যাচ্ছে, এই এক দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়ে উঠল ব্রিটিশ শাসনের আওতার মধ্যে থেকেই। লর্ড মেকলের চূড়ান্ত লক্ষ্য একাডেমিক নয়, প্রশাসনিক লক্ষ্য- শেষ পর্যন্ত এভাবে সময় ও ঘটনার স্রোতে ব্যর্থ হল। শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি নয়, অন্য কোনো প্রাচ্য ভাষাও নয়, মাতৃভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমি প্রেমও এসে যুক্ত হল। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, যা ক্রমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেবে, এই স্বাদেশিক কর্মপ্রবর্তনারই পুরোগামী ঘটনা।

৪

১৯৪৭ সালে ভারত যখন বিভক্ত হল এবং সেইসঙ্গে বঙ্গদেশও, তার আগেই উপমহাদেশীয় সমাজ ও রাজনীতিতে এত আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে যে, জাতীয় জীবনে শিক্ষা প্রসঙ্গ আর মুখ্য থাকেনি। উপরন্তু বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে আরেকটি বড়ো ক্ষতি সকলের অলক্ষ্যে ঘটে গিয়েছিল, তা হল : বাঙালি মুসলমান আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগতে শুরু করল। সে সংকট আজও কাটে নি; কিন্তু মনে রাখতে হবে, অনাদিকাল থেকে এ সংকট ছিল না। দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে বাঙালি মুসলমানের নিকটে তার ধর্মীয় পরিচয় মুখ্য হিসেবে প্রতিভাত হল। তার ধর্ম বহির্গত বলে এবং তার ধর্মীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বাইরের বলে সে তার অস্তিত্বের বিকাশে মাতৃভাষা বাংলা এবং মাতৃভূমি বঙ্গদেশের আবহমান কালের সংস্কৃতি নিয়ে সোটানায় পড়ে যায়।

পাকিস্তান আমলে শিক্ষানীতি নিয়ে যত এক্সপেরিমেন্ট সেখানে মাতৃভাষার লড়াই মুখ্য হওয়ার এটাই কারণ। সেই সঙ্গে প্রেক্ষাপট হিসেবে এর সমান্তরাল আরেকটি ঘটনাও হিসেবে রাখতে হবে। তা হল, মাদ্রাসা-শিক্ষার অব্যাহত সম্প্রসারণ। মাদ্রাসা-শিক্ষার বয়স এদেশে দুশ' বছর এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে তা চালু থেকেছে। সেখানে কখনো কখনো অবশ্য সংস্কার হয়েছে, যৎসামান্য হলেও। যেমন, ধরা যাক, ১৯১৫ সালে নিউ স্কিম পাঠ্যসূচি প্রবর্তন। পঞ্চাশ বছর ধরে চালু থেকে ১৯৬৬তে উঠে গেছে। পঠনীয় বিষয়ের মধ্যে ধর্মীয় ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রের বাইরেও নানা শাখার বিদ্যাচর্চা এতে সাঙ্গীকৃত হয়েছিল ঠিকই। তার পরেও সার্বিকভাবে সাধারণ সত্য এটাই যে, মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য সর্বদা ধর্মীয় শাস্ত্রাদি অনুশীলনের মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে, ফলে মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে একরৈখিক regimentation মাদ্রাসাগুলোর স্বাভাবিক চারিত্র্যলক্ষণে পর্যবসিত